দৈনিক সংবাদ
প্রকাশ : ১৬ জুন, ২০০৫

মানুষ ও মহাবিশ্ব এবং আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

শহিদুল ইসলাম
অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দু'খানা বই কিছুদিন হলো আমার টেবিলে পড়ে আছে। তার একখানা শিশির কুমার ভট্টাচার্যের 'মানুষ মহাবিশ্ব'। বইটি অনেকদিন হলো শেষ করেছি। বইটির নাম বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না। মানুষ ও মহাবিশ্বের সেই পুরোন সৃজন কথা। বইটি আমার এতো ভাল লেগেছে যে, দেশবাসীকে এই বইটির সংবাদ পৌঁছে দেবার একটা দায়িত্ববোধ অনেকদিন থেকেই আমার মধ্যে কাজ করছে। কিন্তু নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় লেখায় হাত দিতে পারি নি। বইটি প্রকাশ করেছে সময় প্রকাশন, ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

মাত্র সেদিন আমার হাতে এলো অভিজিৎ রায়ের 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'তুমি কি কেবলি ছবি'র একটি লাইন। বইটির নাম দেখে বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করা যায় না। এটা কি কবিতার বই, নাকি গল্প উপন্যাসের? কিন্তু বইটি উল্টালেই দেখা যায়, কভারের পেছনে পরিস্কার ভাবে লেখা আছে - 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক বিবরণ'। অর্থাৎ বই দুখানির বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্য আছে। উভয়েই সহজ সরলভাবে এই কঠিন বিষয়ে ঢুকতে চেষ্টা করেছেন। অভিজিতের বইখানি (২৬৪ পৃষ্ঠার) আমি তিনদিনের মধ্যে শেষ করি। শেষ করার পর বইখানি সম্পর্কে দেশবাসীকে জানাতে প্রলুব্ধ হই। যেহেতু বই দুখানির বিষয়বস্তু এক, তাই এই বই দু'খানি নিয়ে একই সঙ্গে আলোচনা করাটা যুক্তিযুক্ত মনে হলো। অভিজিতের বইখানি প্রকাশ করেছে *অঙ্কুর প্রকাশনী*। দু'খানি বই ই সুখপাঠ্য। তথ্যে ভরপুর নয় শুধু, বিজ্ঞানের স্বপক্ষে তত্ত্বে সমৃদ্ধ। তাই মনের একান্ত তাগিদে বইদুটির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য লিখতে বসেছি। অভিজিতের বইটির নাম যেমন কাব্যিক, তার লেখার মধ্যেও কাব্য এবং সাহিত্যিক গুনাবলী ক্রিড়াশীল।

আগে দেখি দু'জন লেখক তাদের বইয়ের ভুমিকায় কি বলেছেন। মানুষ ও বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির রহস্য নিয়ে কেবল দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাই ভাবেন নি, কবি সাহিত্যিকেরাও যে ভেবেছেন তার ছোট্ট প্রকাশ পাওয়া যায় অভিজিতের ভুমিকায় উদ্ধৃত ওমর খৈয়ামের কয়েকটি পংক্তিতে :

‘কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া
এই যে বিপুল বিশ্ব মাঝ
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে -
হেথায় বা মোর কিসের কাজ?
কোথায় পুনঃ কেই বা জানে
ফিরতে হবে একটি দিন
উধাও সে কোন মরুর পরে
হাওয়ার মতই লক্ষ্যহীন ।’

‘কূপমন্ডুক’ শব্দটির অর্থ কি? সেটা বোঝাতে শিশিরবাবু অতি পরিচিত সেই কুয়োর ব্যাঙ আর সাগরের ব্যাঙের গল্পটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন তারপরই লিখেছেন : ‘আমার পৃথিবীর মানুষেরা অল্পবিস্তর এক একটি কূপমন্ডুক। যে জীবন আমরা ধারণ করি সে সম্পর্কে বিশেষ কিছুই আমরা জানি না। যে জগতে আমাদের বাস সে সম্পর্কেও আমাদের কোন ধারণা নেই। এই মহাবিশ্বটা কেমন, কোত্থেকে এল, এর সৃষ্টিই বা কেন হল, ইত্যাদি কিছুই আমাদের জানা নেই। আমরা কতকগুলো বিশ্বাসে আবদ্ধ থেকে জীবন যাপন করি। জন্মের পর থেকেই আমাদের উপর কতগুলো বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া হয় ফলে এক একটা গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। সারা জীবন চেষ্টা করেও আমরা অনেকেই এ গন্ডী থেকে বেরুতে পারি না। কেউ যদি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসের পরিপন্থী নতুন কোন ধারণা নিয়ে হাজির হয়, তখন আমরা ওই কূপমন্ডুকের মতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি এবং দূর দূর করে তাকে তাড়িয়ে দেই। ভাবি আমার বিশ্বাস কখনো মিথ্যা হতে পারে না। দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা এতবার ঘটেছে যে, এরকম ঘটনাকে ব্যতিক্রম বলে ভাবা যায় না। তাই শিশিরবাবু ঘোষণা দেন যে, এসব সাধারণ মানুষের জন্যই বইখানা তিনি লিখেছেন, কোন বিশেষজ্ঞের জন্য নয়।

এবার দেখি অভিজিৎ কি বলছেন। তিনি বলেন, ‘সৃষ্টি রহস্যকে যৌক্তিকভাবে অনুধাবণ করতে মানুষকে তিনটি বিরাট বাধা পেরুতে হয়েছে। প্রথমটি *মহাবিশ্বের বিশালতা*, দ্বিতীয়টি হচ্ছে *কালের অগ্রগামীতা*, আর তৃতীয় বাধা হচ্ছে *সংস্কারের*। তার মতে ‘সংস্কারের বাধা ডিঙ্গানোই বোধ হয় সবচাইতে কঠিন।’ অভিজিৎ বলছেন ‘বদ্ধ সংস্কারের কারণেই টলেমীয় ভুল ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ জনমানসে রাজত্ব করেছে বহুদিন ধরে। শতাব্দী প্রাচীন সংস্কার আর মিথ্যা অহমিকায় মানুষ ভেবেছে পৃথিবী নামের গ্রহটি ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিশেষ গ্রহ, মহাকাশের সব কিছুই বুঝি এই গ্রহটিকে ঘিরেই আবর্তিত।’ ঠিক একই ভাবে মানুষ ভেবেছে সে ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত এক বিশেষ সৃষ্টি। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা এ ধারণাকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে বিশাল মহাবিশ্বের মাঝে পৃথিবীর অবস্থান একটি ছোট্ট বিন্দুর চেয়ে বেশী নয় এবং ক্রমবিবর্তনের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে নিম্নতর প্রাণ থেকে মানুষের আবির্ভাব।

‘পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে’, কিংবা ‘পৃথিবীর অপর গোলার্ধেও মানুষ বাস করে’ - এই বিশ্বাস যদি হত্যাযোগ্য অপরাধ হয়, তবে আজ পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করা উচিৎ, ধর্মবেত্তাগনও বাদ যাবে না। পৃথিবীকে নতুনভাবে জানার মতো অনেক তথ্য শিশিরের বইয়ে পাওয়া যাবে।

অভিজিৎ বলেন, ‘বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করার জোরালো প্রবণতা আজও আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়’। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রযাত্রার পথে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, অভিজিৎও স্পষ্টভাবে তা নির্ধারণ করেছেন- বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্ব এবং অভিজিৎ বিশ্বাস করেন ‘সভ্যতার অনিবার্য গতি বিশ্বাস থেকে যুক্তির দিকে। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদীরা সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন অবিরত। মানুষের মিথ্যা সংস্কার ভেঙে আমাদের

সভ্যতাকে যুক্তির আলোয় আনতে'। এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠককে জানিয়েছেন অভিজিৎ - 'এ বই রচিত হয়েছে তাদের জন্য যারা যুক্তি ভালবাসেন, যারা অন্ধ বিশ্বাস সরিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চান, সৃষ্টির রহস্যকে বুঝতে চান।' কাজেই লক্ষ্যের দিক থেকে শিশিরের সঙ্গে অভিজিতের কোন বিরোধ নেই। তারা মোটামুটি একই বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে দু'জন দু'রকম পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু তারা দু'জনই একই জায়গায় পৌঁছুতে চান, সে কথা আমি তাদের মুখ দিয়েই শুনিয়েছি। আমি আগেই বলেছি তারা উভয়েই একটা খুব পুরনো বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছেন। কিন্তু যতই পুরনো হোক, সে বিষয়ে আমি সব কিছু জানি - এমন দাবী করার কোন যুক্তি নেই। সত্যি কথা বলতে কি, কোন বিষয়ে আমরা যতটা জানি, তার চেয়েও বেশী জানি না। এই সহজ সরল সত্যটা স্বীকার করলে জ্ঞানের গর্ব করার কোন পথ থাকে না। যেমন নিউটন বলেছিলেন - জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র তার সামনে পড়ে আছে, তিনি দু'একটা নুড়ি কুড়িয়েছেন মাত্র। এটি তার বিনয় ছিল না। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা এমনই মত প্রকাশ করে থাকেন। শিশির নিউটনের উক্তিটি ইংরেজী ভাষায় তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তাই বলছিলাম পুরোন হলেও শিশির ও অভিজিৎ দু'জনই এমন অনেক তথ্য হাজির করেছেন, যা আমি জানতাম না। যেমন আমরা সবাই সক্রেটিস, হাইপাসিয়া, জিওর্দানো ব্রুনোর কথা জানি। প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে জনমত গঠনের অভিযোগে সেকালে শাসকশ্রেণী বিচারের প্রহসন করে সক্রেটিসকে হত্যা করেছিল। উন্মত্ত একদল খ্রীস্টান শেষ রোমান গনিতবিদ হাইপেসিয়াকে তার পড়ার টেবিলে হত্যা করে আনন্দোল্লাস করেছিল। 'পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘোরে' - কোপার্নিকাসের এ আবিস্কারটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে নেমেছিলেন ব্রুনো। সে যুগে এটা ছিল মহা অপরাধ। সেই অপরাধ সহ আরো অন্যান্য অপরাধে ক্যাথলিক গির্জা আদালত তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। শিশির জানাচ্ছেন, 'পৃথিবীর অপর গোলার্ধেও মানুষ থাকতে পারে বলে যারা বিশ্বাস করতেন, তাঁদের অধার্মিক বলে বিবেচনা করা হতো এবং ধর্মসংস্থা কর্তৃক তারা নিগৃহীত হতেন। ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশ্বাসের জন্যই সেকো দাস্কোলিকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।' 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে', কিংবা 'পৃথিবীর অপর গোলার্ধেও মানুষ বাস করে' - এই বিশ্বাস যদি হত্যাযোগ্য অপরাধ হয়, তবে আজ পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করা উচিৎ, ধর্মবেত্তাগনও বাদ যাবে না। পৃথিবীকে নতুনভাবে জানার মতো অনেক তথ্য শিশিরের বইয়ে পাওয়া যাবে।

সমাজ ও সভ্যতার অগ্রযাত্রার পথে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, অভিজিৎও স্পষ্টভাবে তা নির্ধারণ করেছেন- বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্ব এবং অভিজিৎ বিশ্বাস করেন 'সভ্যতার অনিবার্য গতি বিশ্বাস থেকে যুক্তির দিকে। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদীরা সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন অবিরত। মানুষের মিথ্যা সংস্কার ভেঙে আমাদের সভ্যতাকে যুক্তির আলোয় আনতে'।

আমার মনে অনেকদিন ধরে একটি প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিলো- পৃথিবীর ক'জন বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আর ক'জন করেন না। অভিজিতের বইয়ে আমি সে উত্তর পেয়ে যাই। অভিজিৎ জানাচ্ছেন - '১৯৯৮ সালে করা একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ন্যাশনাল অব সায়েন্সের তালিকাভুক্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ বিজ্ঞানী ব্যক্তি-ঈশ্বরে (Personal

God) বিশ্বাস করেন, বাকী ৯৩ শতাংশের মধ্যে ৭২.২ শতাংশ সরাসরি নাস্তিক (Atheist) বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হিসেবে নিজেদের অভিহিত করেছেন, এবং ২০.৮ ভাগ অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic){পৃষ্ঠা ১০০}। এই তথ্য প্রদান করে আভিজিৎ আরো একটি তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যতা কখনোই নির্ভর করে না, নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় লব্ধ প্রমাণের ওপর।' কথাটা যে কত বড় সত্যি তা কোপার্নিকাসের দিকে তাকালে তা পরিস্কার হয়। কোপার্নিকাস নিজে ছিলেন একজন যাজকপুত্র ও যাজক। কিন্তু তিনিই ধর্মীয় এবং অ্যারিস্টটলীয় বিশ্বছবিটার কফিনে প্রথম পেরেকটা ঠুকেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী আবদুস সালাম নিজ মুখে বলেছেন, 'আমি ধর্মে বিশ্বাস করি।' তারপরেও তিনি এত্তবড় একটা আবিস্কার করেন, যার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

শিশির বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্ব থেকে শুরু করেছেন। উপনিষদের সৃষ্টি তত্ত্ব হয়ে তিনি ক্রমশঃ বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিস্কারের দিকে অগ্রসর হয়েছেন খুবই ধারাবাহিকভাবে। আর অভিজিৎ নিজেই বলেছেন, তার বইটি 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক বিবরণ'। অভিজিৎ শুরুতেই বলেছেন, 'ঈশ্বর বললেন- *লেট নিউটন বি*'। এটি তার বইয়ের প্রথম অনুচ্ছেদের নাম। একটি হাসির উপস্থাপনা দিয়ে অভিজিৎ শুরু করেছেন। নিউটন যদি বাংলাদেশে জন্মগ্রহন করতেন তাহলে কি হতো? বংলাদেশে তো আপেলের গাছ নেই। বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল গাছের নিচে যদি বসে থাকতেন, তবে তো তার মাথায় আপেল পড়তো না, বজ্রপাতের মতো কাঁঠালপাত হতো। তখন নিউটন সাহেবের অবস্থা কি হতো? আর মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের আবিস্কারেরই বা কি হতো? এ রসিকতার মাধ্যমে অভিজিৎ বলতে চেয়েছেন যে, এমন একটা গল্প 'ভালগার মিথ' ছাড়া আর কিছু নয়। এর পরের পর্বেই তিনি ফিরে গেছেন গ্যালিলিও ও তার পূর্বসূরীদের কথায়; কোপার্নিকাস, জিওর্দানো ব্রুনোর কথায়। 'সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে' - এই চরম সত্য কথাটি বলে ধর্মসংস্থার হাতে তারা কি অমানুষিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন তা অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় অভিজিৎ তুলে ধরেছেন। গ্যালিলিওর বিচার, ব্রুনো হত্যা ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমানে ক্যাথলিক চার্চের বক্তব্য কি, সে কথা তিনি বলেছেন। তবে শিশিরের মত বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্বের কথা না বললেও অভিজিৎ 'মহাবিশ্ব ও ঈশ্বর : অন্তিম রহস্যের সন্ধানে' নামে একটি পর্বে বিশ্বব্রহ্মান্ডের চির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর ছয় দিনে বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অভিজিৎ প্রশ্ন তোলেন, প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মূখ্য হবে, বিগব্যাঙের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে?' অর্থাৎ, আজকের বিজ্ঞান যেখানে পৌঁছেছে কোন যুক্তিতেই বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অভিজিৎ বলেন, মানুষ আজ পরিস্কারভাবেই জানে যে, মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক কোন 'ঈশ্বর' নামক *বড় বাবু* নন, বরং পদার্থবিজ্ঞানের কিছু নিয়মাবলী।'

বইটির টেকনিকাল আলোচনায় আমি গেলাম না। সেজন্য সম্পূর্ণ বই দুটি পড়ার কোন বিকল্প নেই। শিশির ও অভিজিৎ দুই প্রজন্মের মানুষ। শিশির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গনিতের অধ্যাপক। অবসর গ্রহনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন। তার বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ক প্রকাশনার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় সারাজীবন জ্ঞানচর্চা করেছেন। অপরদিকে এটি অভিজিতের প্রথম বই হলেও ইন্টারনেটের জগতে ইতিমধ্যেই তিনি একটি সুপরিচিত মুখ। বিজ্ঞান, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের আলোকে সমাজ প্রতিষ্ঠার একজন নবীন কর্মী। তার মতে,

বিজ্ঞান বিষয়ে উচু ডিগ্রী লাভ আর বিজ্ঞান মনস্কতা আলাদা দুটি জিনিস। তিনি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সমমনা বাঙলীদের নিয়ে ২০০১ সালে গঠন করেছেন 'মুক্তমনা ওয়েবসাইট' (www.mukto-mona.com)। এটি এখন বাঙালী বিজ্ঞানকর্মী, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের সর্ববৃহৎ অনলাইন সংগঠন হিসেবে দেশে বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে। কলকাতার প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' সম্প্রতি তাকে আজীবন সদস্যপদ দান করে সম্মানিত করেছে। অভিজিৎ রায় পেশায় প্রকৌশলী, BUET থেকে পাস করেছেন। বর্তমানে তিনি সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কর্মরত।

আমি বই দুটির প্রসার কামনা করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টিতে বই দু'খানা বড় ভূমিকা রাখবে।

মানুষ ও মহাবিশ্ব
লেখক : শিশির কুমার ভট্টাচার্য
পৃষ্ঠা : ২৩৬
প্রকাশক : সময় প্রকাশন
মূল্য : ১৭৫ টাকা

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
লেখক : অভিজিৎ রায়
পৃষ্ঠা : ২৬৪
প্রকাশক : অঙ্কুর প্রকাশনী
মূল্য : ১৮০ টাকা